গণবিজ্ঞান ভাবনার পত্রিকা

বিজ্ঞান অন্বেষক

BIGYAN ANNESWAK

বর্ষ-১৬ সংখ্যা-৬ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৯ RNI NO. WBBEN/2003/11192 মূল্য : ৫ টাকা

বেনেবউ এর শুঁয়োপোকা শিকার

ছবি : সম্রাট সরকার

❑ প্রচ্ছদ কথা : বেনেবউ এর শুঁয়োপোকা শিকার ২ ❑ ঠান্ডা না গরম কফি ৩ ❑ রাসায়নিক পদার্থ ৪ ❑ কালো মেঘ ৫ ❑ অ্যানাকোন্ডা ৬ ❑ শংকর ধাতুর কাঁচ ৭ ❑ ঝাপসা ব্ল্যাকবোর্ড : চোখের সমস্যা ৮ ❑ দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান ৯ ❑ বিজ্ঞানের শক্তিশেল ১০ ❑ কুসংস্কার ১১ ❑ পরিবেশ : ক্লোরাল ব্লিচিং ১২ ❑ সংবাদ ১৩ ❑ মহাকাশ : আজব নীহারিকা ১৫ ❑ শব্দছক, কবিতা ও কার্টুন ১৬

সুভাষিতম্

'বিষয়বস্তু যতই মহৎ হোক, মানুষ তার চেনা ভাষায় সেটা না শুনলে তার দিকে মনোযোগ দেয় না।'

—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদের কথা : আরও একটি উল্লম্ফনের চেষ্টা

পিছনে তাকানো কি অন্য অর্থে, সামনে তাকানো নয়? ২০১৭ তে এসে ১৩ বছর ধরে চলে আসা ৮ পাতার 'বিজ্ঞান অন্বেষক'কে যখন ১৬ পাতার নব কলেবর দেওয়া হল, আমরা বললাম কুঁজোরও চিৎ হয়ে শুতে ইচ্ছে করে। আর আজকে পাঠক লেখক সকলের ভালোবাসা আদরে যখন পত্রিকাটি সোহাগি হয়ে উঠেছে, তখন আরেকটি উল্লম্ফনের তোড়জোড় শুরু করেছি। যেন চন্দ্রযানের একটি কক্ষ থেকে অন্য উচ্চতর কক্ষে যাত্রা। শুরু হবে ২০২০ তে। এক্ষেত্রে যাত্রাটি ৩২ পাতার, যাত্রাটি রঙিন প্রচ্ছদের। যদিও এই উল্লম্ফনেও কিছু বাধা আছে। বাধা কাগজের মূল্য বৃদ্ধির, রঙীন ছাপায় অতিরিক্ত মূল্য ইত্যাদি। যেখানে আমাদের উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে উচ্চমানের বিজ্ঞান ও পরিবেশ চেতনার পত্রিকা সকলের মাঝে পৌঁছে দেওয়া, যেখানে সরকারি বা বেসরকারি সাহায্যের আশায় আমরা বসে থাকব না, সেখানে পরিবারের সদস্যরাই প্রত্যয়ী হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। আমরা চাই, তেঁতুল পাতায় সুজন আপনিও আমাদের এই পরিবারের একজন হয়ে যাবেন।

—তাপস মজুমদার

প্রচ্ছদ কথা

সম্রাট সরকার

বেনেবউ এর শুঁয়োপোকা শিকার

বেনেবউ। ইংরেজিতে Black-headed Oriole। নিম্ন-গাঙ্গেয় সমভূমিতে অতি পরিচিত পাখি। কত গান, পুরনো গল্পগাথা রয়েছে পাখিটিকে ঘিরে। ভোরবেলা প্রায় আমার ঘুম ভাঙে বেনেবউ-র ডাক শুনে। আমাদের বাড়ির পেছনের আমবাগানে মিষ্টি সুরে ঘুরে বেড়ায়। পাখিটার ছবি আমি তুলেছি বহুবার। একটা নস্ট্যালজিয়া কাজ করে যখন পাখিটাকে দেখি। আমাদের পুরানো গ্রামের বাড়িতেও আসতো, বসতো। হলুদ-কালো রঙ। দেখতে দেখতে অনেক কিছু মনে পড়ে। ভাবি, জার্মানির বিখ্যাত ফুটবল ক্লাব বুরুসিয়া ডর্টমুন্ড-এর প্লেয়ার নাকি? হলুদ-কালো রঙের আরেকটি প্রাণী বহুকাল ধরে আমাদের দেশে টিকে আছে। আমরা তাকে জাতীয় পশুর মর্যাদা দিয়েছি।

বেনেবউ তার মাথার কালো রঙটি কিন্তু জন্মের প্রথম বছরেই পায় না। নাবালকদের গলায় সাদা রঙের ওপর কালো ছিটে দাগ থাকে।

আমাদের গ্রামের চাষের মাঠগুলিতে বিকেলের দিকে দেখি ওদের। মাঠ লাগোয়া কাঁঠালগাছ, আমগাছ, সজনেগাছগুলো ওদের ঘুরে ফিরে দেখতেই হবে। বেশিরভাগ বুনোফল খায়। তবে বিশেষ দুর্বলতা আছে শুঁয়োপোকাদের ওপর। উত্তরবঙ্গের হিমালয়ের পাদদেশের জঙ্গলগুলোতে ওদের অন্য প্রজাতি Maroon Orioleদেরও দেখেছি শুঁয়োপোকা খেতে।

একদিন ভোরবেলা দেখি আমাদের গ্রামের একটা কুলবাগানে এই রকম একটা নাবালক বেনেবউ মহা-আনন্দে শুঁয়োপোকা খাচ্ছে।

প্রথমে পোকাটাকে ধরেই সুবিধামত জায়গায় নিয়ে যায়।

তারপর গাছের ডালের ওপর পোকাটাকে সজোরে আছড়ায়

যতক্ষণ পোকাটা মরে না যাচ্ছে এবং পেটের নাড়ি-ভুঁড়িগুলো বেরিয়ে আসছে।

সবশেষে টপাস করে গিলে ফেলা। বেনেবউদের ক্ষেত্রে এটি খুব সাধারণ একটা পদ্ধতি খাবার খাওয়ার। তবে তারা অন্য রকমের কিছু করতে খুব একটা অপছন্দ করে এমন নয়। শুঁয়োপোকার জন্য তারা যথেষ্ট অ্যাক্রোব্যাটিক হতে পারে।

সেদিন সন্ধেবেলায় বার্ডিং শেষ করে ফিরে আসছি। বাড়ির কাছেই দেখি একটা গাছের গায়ে কতগুলি শুঁয়োপোকা জড়ো হয়েছে। আর এক নাবালক বেনেবউ তাদের খেতে তৈরি। আলো খুব কম। খেয়াল করলাম শুঁয়োপোকার দলটা মাটি থেকে বড়জোর আটফুট ওপরে আছে। বেনেবউটা মাটির কাছাকাছি একটা মড়া ডালে নেমে আসছে, তারপর উড়ে গিয়ে শূন্যে ভেসে থেকে একটা করে শুঁয়োপোকা গাছ থেকে তুলে চলে যাচ্ছে। অনেকবারের চেষ্টায় ছবি তুলতে অসফল হলাম। হয় ঠিকমতো জায়গা নিতে পারছি না, নয়তো শাটারস্পিড, ফোকাস ইত্যাদিতে গন্ডগোল হচ্ছে। একটা শুঁয়োপোকা ধরতে গেলে ডানার ঝাপটায় বেশ কয়েকটা মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত যখন ঠিকমতো জায়গা নিতে পারলাম আর ক্যামেরার সেটিং চলনসই হল তখন একমাত্র হতভাগ্য শুঁয়োপোকাটি গাছের গায়ে লেপটে আছে। এক চমৎকার শারীরিক কসরত আর মনসংযোগ দেখালো নাবালক বেনেবউটি। উড়ে এসে গাছ থেকে তুলে নিল শেষ শুঁয়োপোকাটিকে। ডানা ঝাপটে কিছুটা পেছন সরে এল। তারপর উড়ে চলে গেল সেদিনের সন্ধের মতো।

সিদ্ধান্ত :

১. বেনেবউটি জানে ঠিক কোন নির্দিষ্ট বিন্দুতে গিয়ে তার সামনের দিকের

গতি শূন্যে নামিয়ে আনতে হবে। না হলে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খেতে হতে পারে। লক্ষ করেছি সে তার সামনের দিকের ওড়ার গতি কম রাখার জন্য গাছটার থেকে খুব দূরে বসেনি যেখান থেকে তার উড়ান শুরু করেছে। কারণ যত দূর থেকে উড়ে আসবে তত বেশি গতি তৈরি হবে আর গাছের ঠিক সামনে নিজের গতিবেগ শূন্য করতেও তার যথেষ্ট অসুবিধা হবে। ডানার সজোরে ডাউনস্ট্রোক (Down Stroke) তাকে গতিশূন্য করেছে। দেহের অক্ষ (Body axis) সামনের দিকে বেঁকে থাকে। ঠিক যে ভাবে আমরা দৌড়ে

এসে কোনো বিন্দুতে থামার জন্য মেরুদন্ড সামনের দিকে বেঁকিয়ে ঝুঁকে পড়ি।

২. এক সেকেন্ডের যে ভগ্নাংশের মধ্যে সে শুঁয়োপোকাটিকে তুলে নিতে পেরেছে, সেই অল্প সময়ের জন্য সে শূন্যে স্থিরভাবে ভেসে ছিল। এই প্রক্রিয়াটিকে বলে হভারিং (Hovering)। ডানার দ্রুত ঝাপটে পাখি অনেক ক্ষেত্রে এভাবে শূন্যে স্থির হয়ে ভেসে থাকতে পারে।

৩. ডানার দ্রুত ও জোরালো ডাউন-স্ট্রোকে কিছুটা পেছনে সরে আসে। লেজ দুদিকে ছড়ানো থাকে। শেষে একটি নির্দিষ্ট দিকে উড়ে যায়।

প্রকৃতি আমাদের সবসময় চমৎকৃত করে। যদি আমরা সেই ভাবে তার দিকে তাকিয়ে দেখি। তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে নিই।

email:samratswagata11@gmail.com • M. 9433962227

অপূর্ব চক্রবর্তী

ঠান্ডা না গরম কফি?

আমাদের অনেকেরই ধারণা হল যে কফি একটি নেশার বস্তু। আধুনিক গবেষণা থেকে জানা গেছে যে গরম কফিতে ঠান্ডা কফির তুলনায় বেশিমাত্রায় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট (Antioxidant) থাকে, যা আমাদের ভাল স্বাস্থ্যের সহায়ক। একটি অনুসন্ধানমূলক গবেষণা জানাচ্ছে যে, গরম কফি পান ক্যানসার, ডায়াবেটিস বা মধুমেহ ও অবসাদের মত রোগের সম্ভাবনা কমাতে সাহায্য করে।

একটি আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দেখিয়েছেন যে, গরম কফিতে প্রচুর পরিমাণে Titratable Acid থাকে অর্থাৎ যে অ্যাসিড কোন অ্যাসিড-ক্ষার বিক্রিয়ায় প্রোটন হারায়, যা কিনা গরম কফির Antioxidant Level (মাত্রা) বাড়ানোর জন্য দায়ী। গবেষকগণ প্রমাণ করেছেন যে, কফিতে এত পরিমাণ Antioxidant থাকে, যার নিয়ন্ত্রিত পান আমাদের শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।

ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের Assistant Professor, Megan Fuller দাবি করেছেন যে, কফির শস্যদানা গরম জলে ভিজিয়ে বা ফুটিয়ে যে পানীয় বানানো হয় তাতে প্রচুর পরিমাণে Antioxidant থাকে। জার্নালে প্রকাশিত পরীক্ষিত ফলাফলেও গবেষকগণ দেখিয়েছেন যে, গরম ও ঠান্ডা উভয় কফির pH মাত্রা (Level) অর্থাৎ অম্লত্ব নির্দেশক (Acidity Indicator) 4.85 থেকে 5.13 এর মধ্যে থাকে।

তথাপি কফি প্রস্তুতকারী কিছু সংস্থা আমাদের জীবনশৈলীর দোহাই দিয়ে এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, পানীয় হিসেবে ঠান্ডা কফি (Cold Coffee) গরম কফির (Hot Coffee) তুলনায় কম আম্লিক (Acidic) কারণ এতে বুকজ্বালা ও অন্যান্য Gastro intestinal সমস্যা কম হয়।

কিন্তু ঐ মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের Professor Niny Rao এর মত হল, কফিপায়ীরা দুই ধরনের কফির (গরম ও ঠান্ডা) তুলনামূলক বিচার করে শুধুমাত্র Gastro intestinal যন্ত্রণার কারণে ঠান্ডা কফি গ্রহণযোগ্য তা মনে করে না এবং গরম কফি বর্জনও করে না।

সুতরাং এটা বলাই যায় যে পরিমিত গরম কফি পান আসলে স্বাস্থ্যবর্ধক।

M 9831812781

অমিতাভ চক্রবর্তী

রাসায়নিক পদার্থ ও কিছু ভ্রান্ত ধারণা

সাধারণ মানসিকতায় এখনো আমরা 'রাসায়নিক পদার্থ' এই কথাটি শুনলেই কেমন যেন অজানা আশঙ্কায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি, তা সে সুস্বাদু খাবার থেকে শুরু করে গায়ে মাখা ক্রিম অবধি। তুলনায় ন্যাচারাল বা হার্বাল প্রোডাক্টের প্রতি আমরা অনেক বেশি আস্থাবান। কিন্তু রাসায়নিক মানেই কি খারাপ বা বিপজ্জনক?

আসলে রাসায়নিক (chemical), এই শব্দটি কিন্তু পদার্থেরই সমার্থক। রাসায়নিক হল আমাদের চারপাশে থাকা প্রায় সবকিছু যাদের ভর আছে। জল, চিনি, লবন ইত্যাদি চেনা পদার্থ থেকে শুরু করে ক্যাফিন (চা এবং কফিতে থাকে), ক্যাপসেইসিন (লঙ্কায়), জিনজেরোন (আদাতে) প্রভৃতি খাদ্যতালিকায় থাকা সবই তো রাসায়নিক পদার্থ। পর্যায় সারণিতে থাকা শতাধিক মৌল, এমনকি এদের সমন্বয়ে গঠিত জল, লবন বা গ্লুকোজের মতো ছোট অণু অথবা প্রাণের একক DNA এবং পলিথিলিনের মতো বিশালাকার অণু সবই আসলে রাসায়নিক পদার্থ। এবার রাসায়নিক নিয়ে কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার দিকে নজর দেওয়া যাক।

রাসায়নিক মুক্ত পণ্য নিরাপদ :

প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট, পরিবেশে যা কিছুর সংস্পর্শেই আমরা আসি না কেন সবই কিন্তু রাসায়নিক পদার্থ। বর্ণ-গন্ধ-স্বাদ যুক্ত যে কোনো পণ্যই তো আসলে কোনো না কোনো রাসায়নিক দ্রব্য। রাসায়নিক মুক্ত পণ্য বাস্তবে অসম্ভব। বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারিত রাসায়নিক মুক্ত পণ্যের যেসব বিজ্ঞাপন আমরা দেখতে পাই সেখানে সম্ভবতঃ ক্ষতিকর রাসায়নিক মুক্ত পণ্যের কথা বলা হয়ে থাকে। তবুও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি হয়ত রসায়নাগার-জাত পদার্থের ভীতি (যা অনেক ক্ষেত্রেই অমূলক)-কে বাণিজ্যিক স্বার্থেই সাধারণের মধ্যে লালন করে থাকে।

তাছাড়া বিভিন্ন রাসায়নিকের আপাত অচেনা খটোমটো নামও সাধারণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। মনে হয় সেই পদার্থটি হয়ত ব্যবহারের জন্য নিরাপদ নয়। কিন্তু কোনো রাসায়নিকের নাম দেখেই যেমন সেইটির উৎস সম্পর্কে কোনো ধারণা করা যায় না, তেমনি তাকে বিপজ্জনক আখ্যাও দেওয়া যায় না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ঔষধ হিসাবে অ্যাসপিরিনের ব্যবহার বহুকাল ধরেই আমাদের মধ্যে চলে আসছে। কিন্তু অ্যাসিটাইল স্যালিসাইলিক অ্যাসিড (অ্যাসপিরিনের রাসায়নিক নাম), এই নামটি শুনলেই সাধারণের মনে গবেষণাগারে থাকা কোনো অজানা (হয়ত ক্ষতিকর!) পদার্থের কথা মনে আসতে পারে। একই কথা প্রযোজ্য ১, ৩, ৭-ট্রাইমিথাইলজ্যানথিন নামক রাসায়নিকের ক্ষেত্রেও, যা আসলে ক্যাফিন।

জৈব পদার্থ বনাম রাসায়নিক পদার্থ :

ল্যাভয়সিয়ের

সেই ফরাসি বিপ্লবের বছরে (১৭৮৯ সালে) রসায়নবিদ ল্যাভয়সিয়ে লিখেছিলেন *'Traite elementaire de chimie'*। যার অর্থ হল কোনো কিছুই সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না, সবকিছুই (পদার্থ) রূপান্তরিত হয় মাত্র। হাতের কাছে থাকা জানা পদার্থগুলিকে নিয়েই রসায়নবিদগণ নতুন নতুন পদার্থ তৈরি করে থাকেন। তাদের মধ্যে কোনো কোনোটি হয়ত জৈবযৌগ (যদিও গবেষণাগারে সংশ্লেষণ করা হয়েছে)। কারণ তাদের মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন (এবং কখনো অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি) পরমাণুগুলি নির্দিষ্ট ধরনের গঠনসজ্জায় রয়েছে। আর রসায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে পেট্রোল বা কেরোসিনও যে একটি জৈব পদার্থ তা কি আমরা কখনো ভেবে দেখেছি? আসলে কোনো রাসায়নিকের উৎস দেখেই সেটির ক্ষতিকর বা নিরাপদ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। আর রসায়নাগারে উৎপন্ন অনেক প্রাকৃতিক জৈব পদার্থের (যেমন রাইসিন বা সাপের বিষ) বিষাক্ততা তো অত্যন্ত স্বল্প মাত্রাতেও প্রাণনাশক হিসাবে চিহ্নিত।

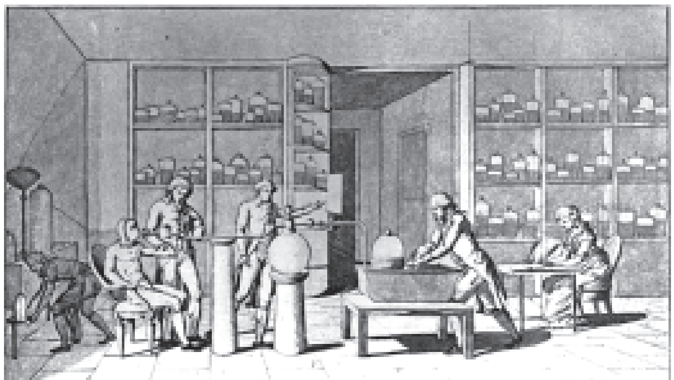

ল্যাভয়সিয়েরের গবেষণাগার

তবে নিরাপদ বা প্রয়োজনীয় পদার্থের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারও কিন্তু বিপদ ডেকে আনতে পারে। যেমন দৈনিক ৬ লিটারের বেশি জল বা ১১৮ কাপের বেশি কফি অথবা ৫৮৫ মিলিলিটার অ্যালকোহল সেবন প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে। আবার আপেলে সামান্য মাত্রার সায়ানাইডের উপস্থিতি নিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওঠার তেমন কোনো কারণ নেই।

রসায়নবিদরা সন্দেহজনক :

সেই অতীতকাল থেকেই বিজ্ঞানী বিশেষতঃ রসায়নবিদদের সাথে খুব খারাপ বা সন্দেহজনক তকমা লেগে আছে। হয়ত রসায়নাগারে আপাত অচেনা রাসায়নিক নিয়ে তাঁরা গবেষণা করেন বলেই। আর ইতিহাসও অনেক সময়ই আমাদের মত সাধারণ মানুষের ধারণাকে সমর্থন করে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে বিখ্যাত জার্মান রসায়নিবিদ ফ্রিৎজ হ্যাবারের নাম, যিনি নিজে একজন প্রথম শ্রেণির বিজ্ঞানী (নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে যিনি অ্যামোনিয়া প্রস্তুতির পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। এই সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবে ১৯১৮ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন) হয়েও দীর্ঘ সময় মারাত্মক সব রাসায়নিক অস্ত্র তৈরির গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। মানবতা বিরোধী তাঁর এই বিজ্ঞান সাধনার প্রতিবাদ হিসাবে হ্যাবরের স্ত্রী এক পার্টি চলাকালীন সর্বসমক্ষে স্বামীর সার্ভিস রিভলবার দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছিলেন। কিন্তু তবুও হ্যাবারকে টলানো যায়নি। তাছাড়া বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে সমগ্র পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর রকম বিষক্রিয়ার একাধিক ঘটনার কথা নথিভুক্ত আছে, যেখানে কোনো না কোনো রসায়ন গবেষক বা গবেষণাগার সরাসরি জড়িত ছিল। যার সাম্প্রতিক উদাহরণ আমেরিকার নিউ জার্সি। যেখানে ১৪ জানুয়ারি, ২০১১ জিয়াওয়ি ওয়াং নামে ৩৯ বছরের এক কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারকে তার রসায়ন গবেষক স্ত্রী থ্যালিয়ামের বিষক্রিয়ায় হত্যা করেন। এই ঘটনার প্রায় ১৬ বছর আগে চিনা ছাত্রী ঝু লিঙ-ও একই রকম বিষক্রিয়ার শিকার হয়েছিলেন যেখানে অন্যতম সন্দেহভাজন ছিলেন তার বান্ধবী ও রুমমেট সান উই, যিনি রসায়ন গবেষণার সাথে যুক্ত ছিলেন। চিন সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবাদ মাধ্যমে এই লু ঝিঙ-এর ঘটনা আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল।

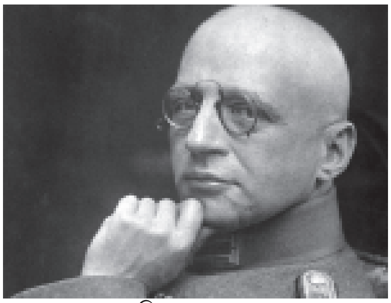

ফ্রিৎজ হ্যাবারে

তবে রসায়নবিদ মাত্রেই কিন্তু অপরাধপ্রবণ বা মানব সভ্যতার ধ্বংসকারী নন। রসায়নবিদ সহ বিজ্ঞানী মাত্রেই মানব সভ্যতার উন্নতিকল্পে দায়বদ্ধ। আবিষ্কারের আনন্দে ও দায়বদ্ধতার তাগিদেই তাঁরা ব্যস্ত থাকেন নতুন নতুন রাসায়নিক পদার্থ তৈরিতে বা এদের বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি জানতে। তাঁদের আবিষ্কৃত কোনো নতুন পদার্থই হয়ত অদূর ভবিষ্যতে চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রযুক্তি বা পরিবেশবান্ধব কোনো কিছু হিসাবে আমাদের মানব সভ্যতাকে আরো খানিকটা এগিয়ে দেবে।

email : acnbu13@gmail.com • M. 8967965340

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

কালো মেঘের আনাগোনা

আকাশে যে মেঘ দেখা যায় তার রঙ বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন হয়। কখনও সাদা, কখনও কালো অবার কখনও হালকা কালো। কালো রঙের মেঘ প্রধানত বর্ষাকালে দেখা যায়। এই ধরনের মেঘের আনাগোনা মানেই মুষলধারায় বৃষ্টি। একে আমরা অনেকেই 'সময় বৃষ্টির মেঘ' বলে থাকি। এই মেঘ আকাশে দেখা দিলে শুরু হয় আলো-আঁধারের খেলা। মেঘ যত জমাট বাঁধে, চারদিকে নেমে আসে তত অন্ধকার।

আমরা জানি মেঘের সৃষ্টি হয় বাতাসে ভেসে বেড়ানো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দু বা বরফের কণা থেকে। পৃথিবীতে যেসব জলাধার (পুকুর, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি) আছে তাতে যখন সূর্যকিরণ পরে তখন তার জল থেকে বাষ্পের উৎপত্তি হয়। এই বাষ্প বায়ুতে মিশে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপরে উঠতে থাকে। উর্ধ্বাকাশে বায়ুর চাপ কম হওয়ায় এই আর্দ্র বায়ু যত উপরে উঠতে থাকে তত এর আয়তন বৃদ্ধি পেতে থাকে। অর্থাৎ প্রসারিত হতে থাকে। সেইসঙ্গে এর উষ্ণতা কমতে থাকে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে পেতে যখন ১০০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়, তখন বায়ুতে অবস্থিত জলীয় বাষ্প ভাসমান কণার উপর জমতে থাকে। ধীরে ধীরে এই জলবিন্দুগুলি বড় হয়। আবার কখনও কখনও জমাট বেধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফের আকার ধারণ করে। পরবর্তীকালে এই জলবিন্দুগুলি বা বরফের কণাগুলি বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি বা তুষার হয়ে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। বৃষ্টির আগে ও পরে মেঘের রঙের পরিবর্তন ঘটে। অনেক সময় এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার পরে সূর্য বা চাঁদের চারদিকে এক ধরনের মৃদু আলোকচ্ছটা বা মন্ডল দেখতে পাওয়া যায়। এর কারণ মেঘে অবস্থিত জলবিন্দুর ভিতর দিয়ে আসা আলোর বা আলো-আঁধারি রেখার বিশ্লেষণ। এই জলবিন্দুর আয়তন বা আকারের উপর নির্ভর করে জলীয় বাষ্পের ঘনত্ব যত বৃদ্ধি পায় মেঘের রঙ তত কালো দেখায়। বর্ষার মেঘে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ও ঘনত্ব খুব বেশি থাকে। তাই বর্ষাকালে মেঘের রঙ সাধারণত কালো দেখায়।

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

অ্যানাকোন্ডা

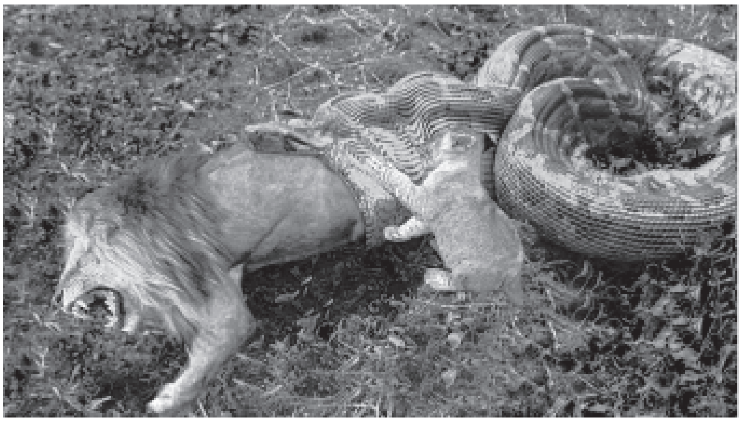

অ্যানাকোন্ডার সাথে বেশিরভাগ লোকের পরিচয় রূপালী পর্দার মাধ্যমে। বিশাল দেহি দানবীয় শক্তির অধিকারী অ্যানাকোন্ডার ক্রিয়াকলাপ আমাদের শিহরিত করে। লেজের ঝাপটায় কখনও ভাঙছে বিশাল আকারে জাহাজ, কখনও পেঁচিয়ে ধরছে জলজ্যান্ত মানুষের শরীর, আবার কখনও মানুষের গোটা দেহ গিলে ফেলে পরক্ষণেই উগরে দিচ্ছে। এই সব ভয়ঙ্কর কাণ্ডকারখানার দ্বারা সাপটি সকল মানুষের কাছ থেকে সমীহ আদায় করে নিয়েছে। তবে রূপোলি পর্দার এই অ্যানাকোন্ডার সঙ্গে বাস্তবের অ্যানাকোন্ডার কিন্তু বিস্তর ফারাক।

সাপ কথাটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভীতি। ল্যাতপেতে সাপ বা বিশাল দেহের সাপ যাই হোক না কেন প্রাণীটিকে ভয়ের দৃষ্টিতেই দেখে বেশিরভাগ মানুষ। সারা পৃথিবীতে সাপ আছে প্রায় দুহাজার প্রজাতির, এদের মধ্যে মাত্র ২৮০টি প্রজাতি বিষধর।

পৃথিবীতে প্রথম সরীসৃপের আবির্ভাব ঘটেছিল প্যালিওজোয়িক যুগের কার্বনিফেরাস পর্বের শেষদিকে অর্থাৎ এখন থেকে বাইশ কোটি বছর আগে। এরপর প্রায় চোদ্দ থেকে উনিশ কোটি বছর আগে মেসোজোয়িক যুগে সরীসৃপরাই পৃথিবী শাসন করেছিল। এদের মধ্যে ব্রন্টোসোরাস বা টিরানোসোরাসের মত অতিকায় সরীসৃপ যেমন ছিল তেমন ছিল ছোট আকারের সরীসৃপরাও তাই বলা যেতে পারে সাপ হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন বাসিন্দা।

বাস্তবের অ্যানাকোন্ডার দেখা মেলে সাধারণত আমাজন নদীর উপত্যকায়। এছাড়াও ব্রাজিলের দুর্ভেদ্য জঙ্গলে, পেরু, গায়না, ত্রিনিদাদ, প্যারাগুয়ে প্রভৃতি স্থানেও এদের দেখা পাওয়া যায়। তবে রূপোলী পর্দায় যে অ্যানাকোন্ডাকে দেখা গেছে সেটা এইসব অঞ্চলের কোনো অ্যানাকোন্ডা নয়। আসলে এটা একটা রোবট সাপ। ফোম এবং রবার দিয়ে তৈরি জাঁদরেল গতরের এই রোবট সাপটি বানিয়েছিলেন ওয়াল্ট কন্টি। হাইড্রলিক রোবট আর কম্পিউটার গ্রাফিক্স ইমেজিংয়ে বানানো অ্যানাকোন্ডাকে তিনি চলচ্চিত্রের পর্দায় দেখিয়ে সারা বিশ্বকে চমকে দিয়েছেন। ছবির পর্দায় এই সাপটির নড়াচড়া, চলাফেরা এতই জীবন্ত যে কখনই মনে হয়নি এটা একটা রোবট অ্যানাকোন্ডা বরং এর শিহরণ জাগানো কাজকর্ম দেখে বাস্তবের অ্যানাকোন্ডা সম্পর্কে অনেক আষাঢ়ে গল্পের সৃষ্টি হয়েছে।

অ্যানাকোন্ডা বিষহীন সাপ। সাপের রাজত্বে সব থেকে লম্বা ও ভারি সাপ হল রিগ্যাল পাইথন। এটি দৈর্ঘ্যে প্রায় দশ মিটার। বার্মা, ফিলিপাইন, ইন্দোচিন, মালয় ও ভারতের নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এদের বাস। দৈর্ঘ্যের দিক থেকে পরের স্থানটি হল অ্যানাকোন্ডার। লম্বায় প্রায় সাত মিটার। বৈজ্ঞানিক নাম ইউনেকটিস ম্যুরিনাস *(Eunectes murinus)*। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর উপত্যকার বাসিন্দা অ্যানাকোন্ডা জলের কাছাকাছি থাকতে ভালোবাসে। কখনও কখনও এরা সমস্ত দেহটাকে জলে ডুবিয়ে শুধু মাথাটা জাগিয়ে রাখে। তাই এদের অনেক সময় জল বোয়াও (Water boa) বলে। অ্যানাকোন্ডা কথার অর্থ হাতির হত্যাকারী। এই নামটি তামিল ভাষা থেকে নেওয়া। 'আনাই' এবং 'কোলরা' শব্দ দুটি মিশে হয়েছে 'অ্যানাকোন্ডা'। 'আনাই' কথার অর্থ হাতি আর 'কোলরা'-র অর্থ হত্যাকারী। আসলে সাপটি যে বিশাল দেহের অধিকারী এবং অসম্ভব শক্তিশালী সেটা বোঝানোর জন্যই অ্যানাকোন্ডা নামের ব্যবহার। এর পরের স্থানটি অর্থাৎ তৃতীয় স্থানটি দখল করে আছে ভারতীয় ময়াল সাপ। ময়াল বা অজগর প্রায় ছয় থেকে সাত মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। দেহ হয় অত্যন্ত মোটা ও ভারি। গায়ে থাকে কালো, হলুদ, বাদামী ও সবুজ রঙের বাহারি চিহ্ন। এরা লোকালয়ে থাকে না। পাহাড়ে, জঙ্গলে এবং জলাশয়ের ধারে থাকতেই ভালোবাসে। শিকারকে পেঁচিয়ে ধরে দেহের প্রচণ্ড চাপে তাকে মেরে ফেলে। তারপর আস্তে আস্তে গিলে খায়। খেতে দীর্ঘ সময় লাগে। একবার খাদ্য গ্রহণ করলে সেটা হজম না হওয়া পর্যন্ত এরা আর কোনো খাবার খায় না। তখন এরা বিশ্রাম নেয়। খাবারের পরিমাণ ও হজমের সময়ের উপর নির্ভর করে এদের বিশ্রামকাল। এই বিশ্রামের সময় কখনও কখনও এক বছর পর্যন্ত হতে পারে। অ্যানাকোন্ডার স্বভাবও একই রকম।

সাপ সাধারণত ডিম পাড়ে। এমনকি ময়াল বা অজগরও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে অ্যানাকোন্ডা ডিমের পরিবর্তে একবারে আশি থেকে একশোটা বাচ্চা দেয়। সাপের জগতে এই ঘটনা শুধু ব্যতিক্রমই নয়, বিস্ময়করও বটে।

পরিশেষে বলি অ্যানাকোন্ডা নিয়ে যে সব রোমহর্ষক গল্প শোনা যায় তার প্রায় সবটাই আজগুবি। বাস্তবের অ্যানাকোন্ডা কোনোদিনই লুই লোসারের পরিচালিত চলচ্চিত্রের অ্যানাকোন্ডা হতে পারবে না।

email : kbb.scwriter@gmail.com ● M. 9433145112

তপন দাস

সংকর ধাতুর কাঁচ

মানব সভ্যতার সূচনা পাথর দিয়ে শুরু হলেও, অল্পদিনের মধ্যেই তা ধাতুর ব্যবহারের দিকে মোড় নেয়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে। লোহা, তামার জিনিস মানুষ ব্যবহার শুরু করেছিল ঠিকই কিন্তু পাশাপাশি সভ্য মানুষেরা খুঁজতে শুরু করেছিল নতুন নতুন ধাতু। ধাতু দিয়ে যেমন তৈরি হতে লাগল দৈনন্দিন জীবনে রান্নাঘরে ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিস, ঠিক তেমনি কৃষিকাজে ব্যবহৃত সামগ্রী। সভ্যতা এগিয়েছে, এগিয়েছে বিজ্ঞান গবেষণা, এগিয়েছে প্রযুক্তিবিদ্যা। বিজ্ঞানীরা খুঁজে বের করেছেন প্রায় ৮০টি ধাতু। শুধু তাই নয় তারা দেখিয়েছেন কিভাবে বিভিন্ন ধাতু কোথায় কাজে লাগানো যায়। তাইতো আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা একদিকে যেমন সাধারণ ধাতুর ব্যবহার শিখেছি অন্যদিকে গ্যাডোলিনিয়াম Gadolinium (Gd) এর মত ধাতুকে কিভাবে MRI (Magnetic Resonance Imaging)-তে ব্যবহার করা যায় সেটাও জেনেছি। পাশাপাশি ধাতুবিদ্যায় সংযুক্ত হয়েছে সংকর ধাতুর ব্যবহার (ব্রোঞ্জ, কাঁসা, পিতল ইত্যাদি)। কিন্তু এই আলোচনায় আলোকপাত করতে চাইছি সংকর ধাতুর তৈরি কাঁচ এবং কাঁচের ব্যবহারের কথা।

প্রথম আবিষ্কৃত ধাতুর কাঁচ

১৯৭০ সালের দিকে প্রথম আবিষ্কৃত হয় এমন এক প্রকারের পদার্থ যা ধাতু এবং কাঁচ উভয়ের ধর্মই প্রদর্শন করে। যা প্রধানত দুই প্রকার— i) ধাতু-ধাতু ধাতব কাঁচ (Ni-Nb, Mg-Zn, Cu-Zr, Hf-V) ii) ধাতু-ধাতুকল্প (Fe, Co, Ni এবং B, Si, C, P) ধাতব কাঁচ। [*Ni-Nb : নিকেল-নায়োবিয়াম, Hf-V : হাফনিয়াম-ভ্যানাডিয়াম, Cu-Zr : কপার-জারকোনিয়াম*]

W. Klement, Willies and Duwez সবার প্রথম Au-Si ধাতব কাঁচ তৈরি করলেও পরিবর্তিতে Lieberman, Ralf Busch-এর মত অনেকেই নতুন নতুন বিভিন্ন ধরনের সংকর ধাতুর কাঁচ প্রস্তুত করেছেন যা ধাতুবিদ্যায় এক যুগান্তকারী পথ দেখিয়েছে। অধ্যাপক R. Busch (Oregon State University)-এর তৈরি তরল সংকর ধাতুটি Zirconium, Titanium, Copper, Nickel এবং Beryllium এর তৈরি।

রাল্ফ বুশ্চ

এবার জানা যাক এদের বিশেষ ধর্মগুলি কি কি? প্রায় সমস্ত ধাতু বা সংকর ধাতুর নিয়তকার গঠন দেখা গেলেও ধাতব কাঁচ অনিয়তকার হয়। যেখানে পরমাণুগুলি কমবেশি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। অনিয়তকার আকৃতির এই ধাতব কাঁচের মূলত দুটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত অন্যান্য কাঁচের মত এটিও সন্ধিগত তাপমাত্রায় Super cooled তরলের মত আচরণ করে এবং এই ধরনের আচরণের জন্য একে অনেক বেশি নমনীয় জিনিস প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা যায়। দ্বিতীয়ত এই সংকর ধাতুর কাঁচে কোনো নিয়তকার ত্রুটি (Crystalline defect) দেখা যায় না। যার ফলে এই দৃঢ় কাঁচকেও খুব সহজে কোমলায়ন করা সম্ভব হয়।

ধাতু বা সংকর ধাতুর ব্যবহারের চিরাচরিত গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এই ধরনের ধাতব কাঁচ একদিকে যেমন উচ্চরোধ সম্পন্ন হওয়ায় কম্পিউটারের মেমরি বা Magnetic Resistance Sensor তৈরিতে ব্যবহার করা গেছে। ঠিক আবার Fusion Reactor এর চুম্বক বা Nuclear waste disposal এর পাত্র তৈরিতে ব্যবহার করা গেছে।

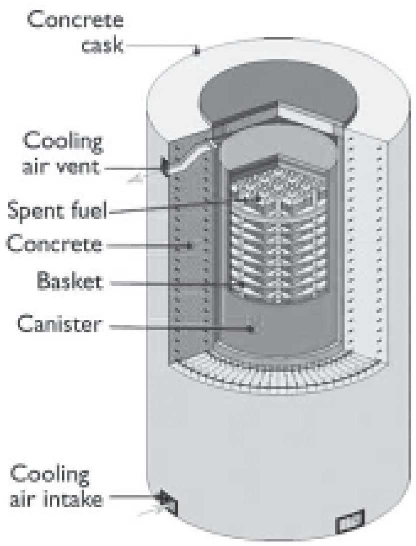

পারমানবিক বর্জ্যের পাত্র

এর জারন ক্রিয়া প্রায় শূন্য হওয়ায়, একটি অতিমুখ্য চ্যানেলের মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া দ্রুত ঘটানো সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে শল্যচিকিৎসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এমনি Razor blade তৈরিতেও ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। আবার অন্যদিকে ইমারতের স্থায়িত্ব বা ক্ষমতা বাড়াতে যেমন ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে অন্যদিকে Rubber বা Plastic প্রযুক্তিতে এর ব্যবহার অপরিসীম। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি কখনো দাঁড়িয়ে থাকে না। এই সংকর ধাতুর তৈরি কাঁচ আর কোন্ নতুন দিশা দেখাবে তারই চেষ্টা নিরলসভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন একদল বিজ্ঞানী।

email : tdcob25@gmail.com • M. 9434686749

শিবপ্রসাদ পাল

ঝাপসা ব্ল্যাকবোর্ড : স্কুল পড়ুয়াদের চোখের সমস্যা

সায়নী ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হল। নতুন ড্রেস, জলের বোতল, আইডেনটিটি কার্ড, লম্বা লিস্ট। পড়াশুনার সিলেবাসও লম্বা। স্কুলঘর লম্বা। কয়েকমাস পর ক্লাস টিচার ওর মাকে ডাকলেন। ‘সায়নীর বোর্ডের লেখা দেখতে অসুবিধা হয় আপনি ওকে চোখের ডাক্তার দেখান।’—দিদিমণির এই কথাতেই ওরা এখন আমার সামনে, হাসপাতালে। ‘তোমার কি অসুবিধা’—প্রশ্ন করাতে সায়নী বলে ‘বোর্ডে লেখা ঝাপসা লাগে।’ ‘এর আগে অসুবিধা হয়নি’ মাকে প্রশ্ন করি। সায়নীর মা বলে—‘না, এই স্কুলে আসার পর হচ্ছে।’ ড্রপ দিয়ে পাওয়ার পরীক্ষা করে জানালাম সায়নীর পাওয়ার মাইনাস তিন। একমাস পর ওর মা এসে জানাল ও এখন চশমা পরে বোর্ডের লেখা পড়তে পারছে।

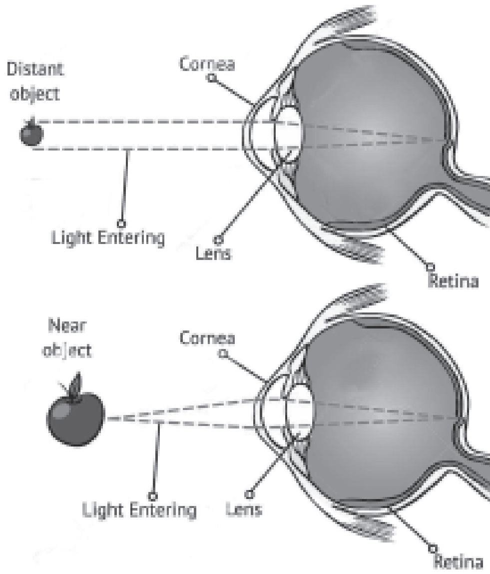

নতুন স্কুলে সায়নীর চোখে ব্ল্যাকবোর্ড ঝাপসা হল কেন? কেনই বা মাইনাস তিন পাওয়ারে দেখতে পেল? আসুন জানা যাক এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। আলো প্রথমে বোর্ডের সাদা চকের লেখার উপর

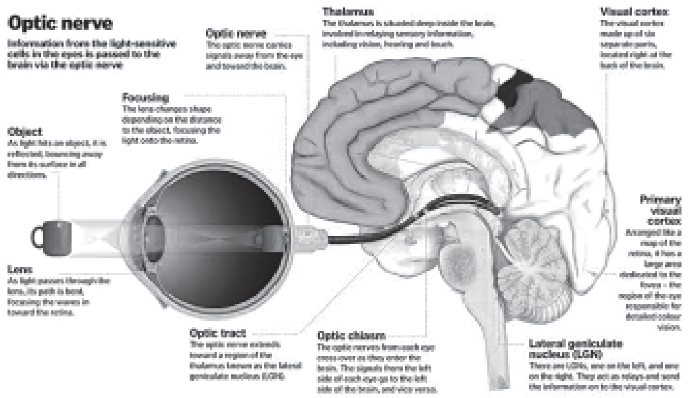

পড়ছে, তারপর প্রতিফলিত হয়ে সোজা সায়নীর চোখে। সেখানে কর্ণিয়া আর লেন্স এই দুই শক্ত মাধ্যমে প্রতিসরিত হয়ে রেটিনায় একটা বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে। রেটিনায় তৈরি উদ্দীপনা দৃষ্টিস্নায়ু দিয়ে মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রে পৌঁছালে সায়নী লেখা দেখতে পারবে। একেই বলে চোখের প্রতিসরণ। কিন্তু সায়নী দেখতে পেল না। তার মানে ওর প্রতিসরণের ত্রুটি আছে, আমরা বলি রিফ্র্যাকটিভ এরর (প্রতিসরণের প্রতিবন্ধকতা)। এরই জন্য ওই মাইনাস পাওয়ার লাগছে। মাইয়োপিয়া অর্থাৎ দূরদৃষ্টি কম। মাইয়োপিয়াতে চোখের আকৃতি বড় হয়। প্রতিসরিত আলোর বিন্দু রেটিনার সামনে পড়ে। তাই বাইরে মাইনাস লেন্স বা বাইকনকেভ লেন্স দিয়ে আলোর রেখাকে অপসারিত (ডাইভার্জ) করিয়ে দিলেই রেটিনায় পড়বে। সায়নী দেখতে পারবে।

আর এক রকমের ত্রুটি আছে যাকে বলা হয় হাইপারমেট্রোপিয়া। এতে কাছের বস্তু দেখতে অসুবিধা হয়। চোখের আকৃতি ছোট হয়। আলোর রেখা পর্দার পিছনে মিলিত হয়। সামনে প্লাস পাওয়ার বা বাইকনভেক্স লেন্স দিলে আলোর রেখা অভিসারিত (কনভার্জ) হয়ে সামনে এসে রেটিনায় পড়ে। তখন দেখা যায় দৃশ্যবস্তু।

প্রধানত এই দুই ধরনের প্রতিসরণের ত্রুটি হয়। স্কুলের শিশুদের নিয়মিত চোখ পরীক্ষা করলেই জানা যায় কার অসুবিধা আছে। অনেকেই পরীক্ষা করান না। তাহলে কি হয়? রনির কথাই বলি। হঠাৎই বাঁ চোখে হাত দিয়ে বন্ধ করে ফেলেছিল। তখনই ও বুঝতে পারে ডানচোখে দেখতে পায় না। অথচ ও জানতই না। পরীক্ষা করে বললাম ডান চোখের পাওয়ার প্লাস ছয়। ওর বয়স বারো। এতদিন ডানচোখের রেটিনার উদ্দীপনা কম তৈরি হওয়াতে ওর দৃষ্টিকেন্দ্রের ক্ষমতা বাড়েনি। তাই কম দেখে। আমরা বলি লেজি আই বা এমপ্লাইয়োপিয়া। ছয় থেকে আট বছরের মধ্যে জানা গেলে ওর বাঁ চোখ দিনে দু-তিন ঘন্টা বন্ধ রেখে ডান চোখ দৃষ্টিক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করা যেত। একে বলা হয় অক্লুশন থেরাপি। কিন্তু এখন আর সম্ভব নয়।

তাহলে জানা গেল প্রতিসরণের ত্রুটি থাকলে চশমার পাওয়ারের

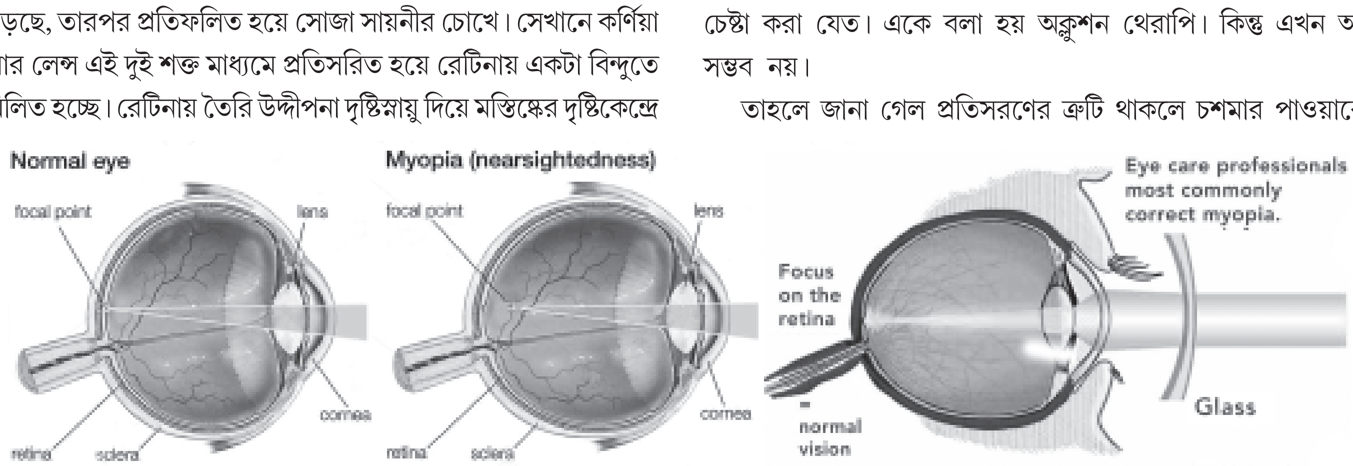

সাহায্যে ত্রুটিমুক্তকরা যায়। এছাড়া আর কি উপায় আছে? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক।

এই সমস্যা সমাধানে মাইয়োপিয়াতে তিনটি উপায় আছে। (১) কনট্যাক্ট লেন্স, (২) লাসিক লেসার সাহায্য নেওয়া, (৩) চোখের ভিতর লেন্স প্রতিস্থাপন। পাওয়ার অনুযায়ী কনট্যাক্ট লেন্স কর্ণিয়ার উপর নিজেই পরা যায়। লাসিক লেসার আধুনিক পদ্ধতি। লেসার রশ্মির সাহায্যে কর্ণিয়ার আকৃতি পরিবর্তন করে পাওয়ার স্থায়ীভাবে ঠিক করে দেওয়া যায়। আর অত্যাধুনিক পদ্ধতি হল পাতলা লেন্স অপারেশন করে স্বচ্ছ লেন্সের সামনে বসিয়ে দেওয়া যায়। একে বলা হয় ফেকিক আইওএল ইমপ্ল্যান্ট। খরচ এবং ঝুঁকিসাপেক্ষ। সাধারণত ১৮-২৪ বৎসর বয়সে পাওয়ার স্থায়ী হলেই এই দুই পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়।

হাইপার মেট্রোপিয়াতে সাধারণত কনট্যাক্ট লেন্স আর লাসিক লেসারের সাহায্য নেওয়া হয়।

তাহলে আর দেরি নয়। আজকের পর থেকে ব্ল্যাকবোর্ড ঝাপসা দেখলেই আপনার সন্তানের বা পরিজনের চোখের পাওয়ার পরীক্ষা করান এবং স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে ওর ভবিষ্যতের দৃষ্টিপথকে প্রতিসরণ ত্রুটিমুক্ত করে তুলুন।

M. 9433564719

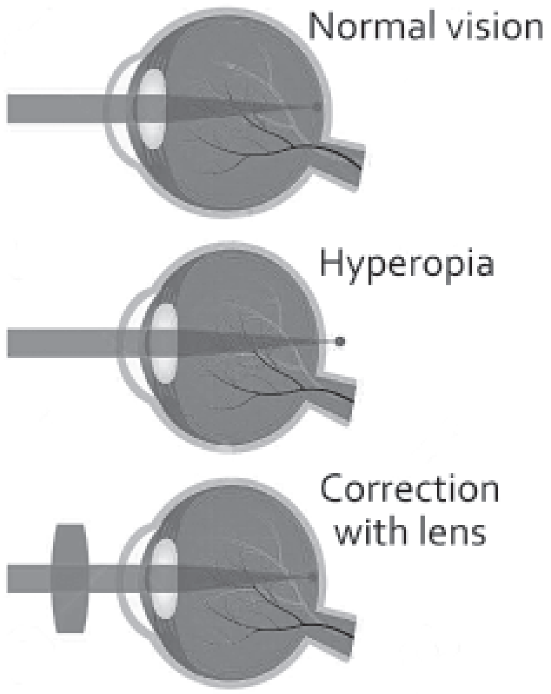

<u>দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান</u>

অনিন্দ্য দে

সমান্তরাল ঢেউ

সমুদ্রের পাড়ে বসে ঢেউ গুনতে কার না ভালো লাগে? ঢেউ-এর পরেতে ঢেউ আসে যায়। বিশাল জলরাশির নানান জায়গা থেকে অসংখ্য তরঙ্গমালা ছুটে এসে জড়ো হয় আপনার পায়ের কাছে এসে। এরা ধেয়ে আসে নানান দিক থেকে। কেউ পূবদিক থেকে, কেউ পশ্চিম থেকে, আবার কেউবা আসে দক্ষিণ দিক থেকে। কিন্তু এই তরঙ্গলহরী যখন আপনার সামনে এসে আছড়ে পড়ে তখন তারা সবাই প্রায় তীরভূমির সমান্তরাল। কখনো ভেবে দেখেছেন কি কেন এমনটা হয়?

আসলে এই তরঙ্গের গতিবেগ নির্ভর করে জলের গভীরতার উপরে। অগভীর জলাশয়ে তরঙ্গের বেগ অনেক কম হয়। একগুচ্ছ তরঙ্গ বেলাভূমির সাথে নির্দিষ্ট কোনও একটা কোণ করে এগোতে থাকলে, তীরের কাছাকাছি যে জলরাশি থাকে তাদের বেগ অনেক তাড়াতাড়ি কমে যায়। তুলনায় যে জলরাশি বেলাভূমি থেকে কিছুটা দূরে থাকে তার বেগ কমে অনেক আস্তে আস্তে। ফলত তীরের কাছাকাছি যে জলরাশি তারা অনেক আগেই তার বেগ হারিয়ে ফেলে। এই তরঙ্গলহরী যত তীরের দিকে এগোতে থাকে ততই তার বেগ আরও কমতে থাকে। ফলে শেষ পর্যন্ত সে যখন তীরে এসে পৌঁছায় তখন ঐ তরঙ্গ তীরভূমির সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল হয়ে পড়ে।

email : anindya05@gmail.com • M. 9432220412

সুজিতকুমার নাহা

বিজ্ঞানের শক্তিশেল

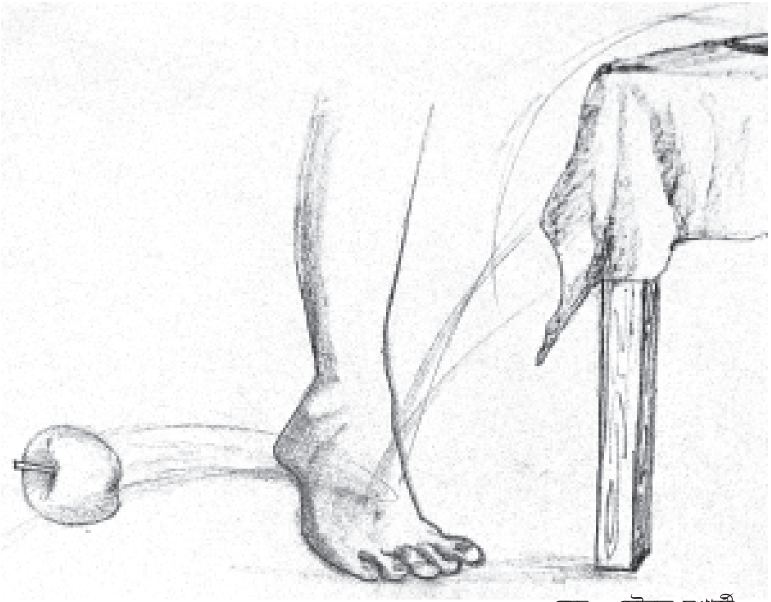

স্কেচ : সৌরভ মুখার্জী

প্রিয় পাঠক, শিরোনাম অবলোকন করে ধন্দে পড়েছেন নিশ্চয়ই। আসলে, শক্তির ধারণাকে ঠিকঠাক 'পাকড়াও' করতে সাধারণ মানুষ তো কোন ছার, বিজ্ঞানীদেরও ব্যাপক বেগ পেতে হয়েছিল। বোধকরি এই কারণেই বিজ্ঞানের জগতে শক্তির আগমন হয়েছিল বেশ দেরিতে। শক্তির ধারণার আধুনিক সংস্করণের জন্য আমরা ঋণী অলোকসামান্য প্রতিভাধর বিজ্ঞানী টমাস ইয়ং-এর (১৭৭৩-১৮২৯) কাছে। তিনি এই কাজটি করেছিলেন ১৮০৭ সালে। শক্তি আর ক্ষমতাকে গুলিয়ে ফেলার এক ক্লাসিক দৃষ্টান্ত হচ্ছে 'অশ্বশক্তি'। হর্স পাওয়ার-এর পরিভাষা 'অশ্বক্ষমতা'-র পরিবর্তে অশ্বশক্তি কথাটা সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেছিলেন, তা বোধকরি আজ আর জানবার উপায় নেই। ভুল কথাটা বাজারে বেশ চালু হয়ে যাওয়ায় ড: দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী সংকলিত 'পদার্থবিজ্ঞানের পরিভাষা' (১৯৭৮) গ্রন্থে 'অশ্বশক্তি' বিরাজমান। অবশ্য বিমলকান্তি সেনের 'পদার্থবিজ্ঞানের পরিভাষাকোষ' (২০১৭) পুস্তকে পাচ্ছি : 'horse power' অশ্বক্ষমতা (অশ্বশক্তি ব্যবহার না করাই ভালো)। যাই হোক, অন্তত কিছুটা হলেও স্বস্তি মিলল। বিজ্ঞান লেখকদের অবিলম্বে অশ্বশক্তিকে বয়কট করা উচিত।

বিজ্ঞানের ভাষায় শক্তি বলতে কী বোঝানো হয়, তা নিশ্চয়ই আমরা জানব। তবে শক্তির সংজ্ঞা-টংজ্ঞা নিয়ে পাঠ্যপুস্তকের স্টাইলে আলোচনা ফেঁদে বসলে যে লাভ কিছুই হবে না বরং সেটা পড়ুয়াদের বিরক্তির কারণ হবে তা অনুমান করতে পারছি। অতএব সেই পথে অগ্রসর হওয়া আদৌ সমীচীন হবে না। আমরা বরং চর্চায় অবতীর্ণ হবো রোজকার জীবনে শক্তির লিপ্ততার (implication) বিভিন্ন দিক নিয়ে।

আসলে শক্তিকে সার্বজনীন বিনিময় মুদ্রা হিসেবে ভাবতে পারি। যেহেতু শক্তির সৃষ্টি কিংবা বিনাশ নেই, আছে শুধু বহুরূপীর মতন এক রূপ থেকে অন্য রূপে পাল্টে যাওয়ার সম্ভাবনা, তাই 'ইউনিভার্সাল কারেন্সির' ইদৃশ ধারণা শক্তিকে বুঝতে সাহায্যের হাত প্রসারিত করবে।

এবার খুলেই ফেলি শক্তি নামের প্যান্ডোরার বাক্সটা। আসলে, শক্তি নিয়ে বাজারে গোলমাল প্রচুর। প্রকৌশলীরা 'কেজি-মিটার' নিয়ে মেতে আছেন, পদার্থবিজ্ঞানীরা মজেছেন 'আর্গ' আর 'ইলেকট্রন-ভোল্টে', রসায়নবিদ আর ডায়েটিশিয়ানরা আবার 'ক্যালোরি' ছাড়া অন্য কিছুতে মোটেও খুশি নন। (আরও ঝঞ্ঝাট, কেমিস্টদের ক্যালোরি আর পুষ্টিবিদের ক্যালোরি এক নয়, ফারাকটা মাত্র (!) এক হাজার গুণ। বুঝুন ব্যাপারখানা! গল্পের শেষ কিন্তু এখানেই নয়। বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানদের আবার এসব কোনো কিছুই পছন্দ নয়, তাঁরা বিদ্যুৎশক্তি 'খরচের' বিল পাঠান 'কিলোওয়াট-ঘন্টা' হিসেবে। দিল্লির মতো পাইপের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহের বন্দোবস্ত থাকলে সেটা নির্ঘাৎ অন্য কোনো এককে বিল করা হত। কী নিদারুণ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি, তাই না? এ পর্যন্ত পড়ে যাঁরা প্রভূত হতাশ হয়ে পড়েছেন, তাঁদের জন্য এবার দেব একটা সুখবর। বর্তমানে বেশ চালু হয়েছে 'S.I. Unit'-এর ব্যবহার। জুল (Joule) নামের এই একককটিকে সর্ব এনার্জি-ঘটের কাঁঠালি কলা হিসেবে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারেন। এক নিউটন বল এক মিটার দূরত্ব বরাবর কাজ করলে সেই কাজের মাপ দাঁড়ায় ১ জুল। আর কাজ ও শক্তি যে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ, সেটা কে না জানে!

পাঠক, আপনি জানতে চাইতেই পারেন ১ জুল ঠিক কত পরিমাণ শক্তি। এই ব্যাপারে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি। ধরা যাক যার মাঝারি সাইজের একটা আপেল টেবিলের ওপর থেকে আপনার পায়ে পড়ল। আপনি 'উঃ' করে উঠলেন বটে তবে আঘাতটা খুব বেশি নয়, তাই না। আসলে, আপেলটা প্রায় ১ জুল শক্তি নিয়ে পায়ে পড়েছিল বলেই লাগেনি তেমন কিছু।

email : sk.naha@gmail.com ● M. 9830367036

পত্রিকা যোগাযোগ

● শিয়ালদহ, যাদবপুর, নৈহাটি, কাঁচরাপাড়া, কল্যাণী, মদনপুর, চাকদহ, রাণাঘাট ও কৃষ্ণনগর স্টেশন ● বৈচিত্র্য, পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু ও মনীষা (কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা) ● জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব M. 9232387401 ● প্রতাপদীঘি লোকবিজ্ঞান সংস্থা M. 9732681106 ● কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা M. 9477589456 ● তপন চন্দ, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার M. 9733153661 ● কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম M. 9434686749 ● গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ M. 9593866569 ● পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ, বারাকপুর M. 9331035550 ● জয়ন্ত ঘোষাল, নৈহাটি M. 8902163072 ● কুনাল দে, ঝাড়গ্রাম M. 9474306252 ● নন্দগোপাল পাত্র, পূর্ব মেদিনীপুর M. 9434341156 ● উৎপল মুখোপাধ্যায়, বারাসাত M. 9830518798 ● ভোলানাথ হালদার, বনগাঁও M. 8637847365

ভ বা নী প্র সা দ সা হু

গরুড় গঙ্গা-র জলে স্বাভাবিক প্রসব?

আমরা সবাই মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীর আলো দেখি স্বাভাবিক প্রসবের মাধ্যমে অথবা সিজারিয়ান অস্ত্রোপচারে। জন্মের ঠিক আগে প্রাকৃতিকভাবেই সাধারণত শিশুর মাথা থাকে নীচের দিকে, পা ওপরের দিকে। শতকরা ৯৬ ভাগ ক্ষেত্রেই এটি হয়। আর মাথা অর্থাৎ তথাকথিত ব্রহ্মতালুর দিক দিয়ে শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়াই স্বাভাবিক প্রসব। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এ সময়ও ফরমেশন বা ভেন্টুসের মত ছোট্ট যন্ত্রের সাহায্য লাগে। কিন্তু মাথা নীচের দিকেই আছে অথচ শিশুটির মাথার ওপরটা অর্থাৎ ব্রহ্মতালু নয়, কপাল বা মুখ দিয়ে যদি প্রসব হওয়ার উপক্রম হয় তবে তা শিশুটির পক্ষে বিপজ্জনক, মায়ের পক্ষেও। তখন পেট কেটে অর্থাৎ সিজারিয়ান অস্ত্রোপচার করে শিশুটিকে মাতৃগর্ভ থেকে বের করাতে হয়। শিশুটির যদি কোমর বা পিঠ নীচের দিকে থাকে (ব্রীচ প্রেজেন্টেশান) তখনও জরুরী ভিত্তিতে তা করা হয়।

এছাড়া শিশুটির মাথা যদি যথেষ্ট বড় হয় (যেমন হয় হাইড্রোকেফালাসে), মায়ের বস্তি অঞ্চলের হাড় অর্থাৎ পেলভিস যদি ছোট হয় (যেমন হতে পারে মা রিকেটে ভুগে থাকলে), অথবা মায়ের বা শিশুর যদি অন্য কোন শারীরিক বিপজ্জনক অবস্থা থাকে, তবেও মা বা শিশু কিংবা উভয়েরই প্রাণ বাঁচাতে সিজারিয়ান অস্ত্রোপচার করতে হয়।

স্বাভাবিক প্রসবই মা ও শিশু উভয়ের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট ও কাম্য। কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয়, তবে দ্বিধা না করে সিজারিয়ান অস্ত্রোপচার করার দরকার হয়। আগে যখন এই ধরনের অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা ছিল না, তখন বহু শিশু ও মায়ের মৃত্যু ঘটেছে, শুধু স্বাভাবিক প্রসবের জন্য অপেক্ষা করে ও চেষ্টা করে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এক্ষেত্রে যুগান্তকারী ও প্রাণদায়ী ভূমিকা রাখছে। অবশ্য স্বাভাবিক প্রসবের পূর্ণ সম্ভাবনা থাকলেও যদি কোন আধুনিক মা গর্ভযন্ত্রণা এড়াতে সিজারিয়ান অস্ত্রোপচার করান কিংবা চিকিৎসক শুধু তাঁর ব্যবসায়িক স্বার্থে এই অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করেন, তবে তা চিকিৎসাবিজ্ঞান বিরোধী তথা প্রকৃতিবিরোধী। তবে এ অন্য প্রসঙ্গ।

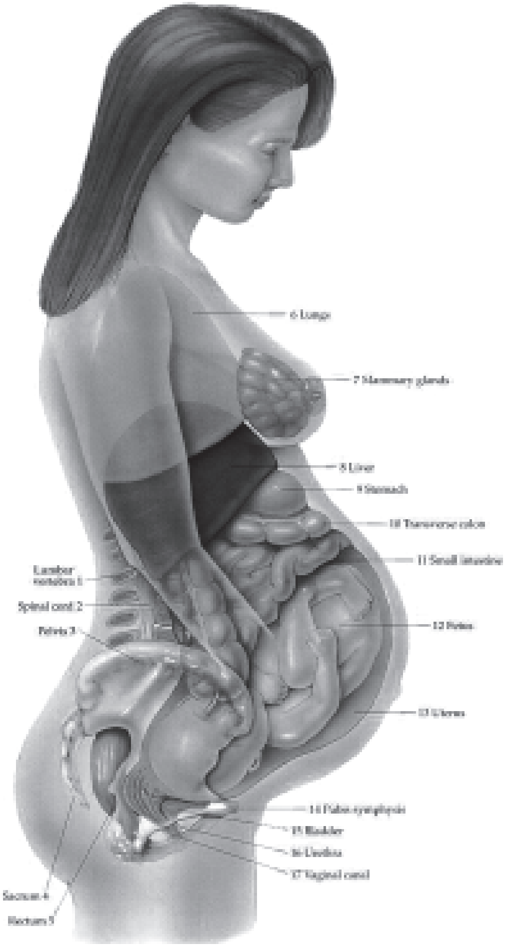

প্রসব প্রসঙ্গে সাধারণ এই কথাগুলি আবারও বলার প্রয়োজন হল স্বাভাবিক প্রসবের জন্য এক 'জননেতার' সাম্প্রতিক হাস্যকর একটি নিদানের খবর সংবাদপত্রে পড়ে। এই ২০১৯-এর জুলাই মাসে আধুনিক ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য উত্তরাখন্ডের জনৈক সাংসদ জানিয়েছেন যে, কুমায়ুনের বাগেশ্বর জেলার গরুড় গঙ্গার জল যদি গর্ভবতী মহিলা পান করে তবে নাকি স্বাভাবিক প্রসব হবে। একজন সাংসদ তাঁর এলাকার কয়েক লক্ষ মানুষের প্রতিনিধি অর্থাৎ এত লক্ষ মানুষ তাঁর অনুগামী। এইসব অনুগামীরা যদি তাঁকে বিশ্বাস করে গর্ভবতী সব মায়েদের গরুড় গঙ্গার জল খাওয়াতে থাকেন এবং শিশুর বা মায়ের যে অবস্থাতেই হোক না কেন, সিজারিয়ান নয়, স্বাভাবিক প্রসবের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন, তবে তার ফলাফল কি হবে? স্পষ্টতই তাহলে ফিরে যাওয়া হবে সিজারিয়ান অস্ত্রোপচার চালু হওয়ার আগের যুগে—যখন মায়ের অবর্ণনীয় কষ্ট, তিলে তিলে মৃত্যু, সঙ্গে শিশুমৃত্যুও ঘটত অতি বিপুল সংখ্যায়। কারণ দ্বিধাহীনভাবে এটুকু বলা যায় যে, কুমায়ুনের গরুড় গঙ্গার জল যদি দূষিত না হয় ও জীবাণুমুক্ত হয় তবে তা তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে, অন্য অনেক জায়গার দূষিত গঙ্গার জল থেকে যেমন টাইফয়েড, জন্ডিস, ডায়ারিয়া ইত্যাদি হতে পারে, তাও হয়ত হবে না—কিন্তু তার পক্ষে গর্ভের শিশুর পিঠ বা কোমর ঘুরিয়ে দেওয়া বা হাইড্রোকেফালাসের মাথা ছোট করে দেওয়া কিংবা রিকেটে ভোগা মায়ের পেলভিস বড় করে দেওয়া সম্ভব নয় অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রসবের ঝুঁকি না নিয়ে, মা ও শিশুকে বাঁচাতে সিজারিয়ান অস্ত্রোপচার করতেই হবে। অন্তত আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান তাইই বলে। আর এ কারণেই যে ধরনের কথাবার্তা অনুসরণ করলে মৃত্যু ঘটতে পারে, ঐ ধরনের কথাবার্তা বলাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা উচিত, তা সে যেইই বলুক না কেন।

(সংবাদসূত্র—আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১.৭.১৯)

email : sahoo2331953@gmail.com ● M. 8777598939

কৌ শি ক রা য়

পরিবেশের এক নতুন আতঙ্ক—কোরাল ব্লিচিং

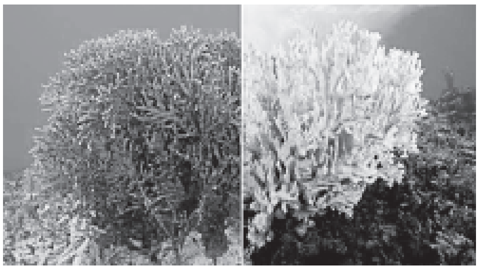

নির্বিচারে গাছ কাটা, জলাশয় বুজিয়ে অনিয়ন্ত্রিতভাবে জনবসতি গড়ে তোলা, "এল নিনো"-র মত খামখেয়ালি বায়ু ও জলস্রোত, চোরাশিকার, জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করার ফলে বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই অক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইড-এর মত ক্ষতিকর গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বাড়তে থাকা—নির্মল বিশ্ব পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলার জন্য অগণিত অসুরের আবির্ভাব ঘটেছে। সম্প্রতি সেই আশঙ্কাজনক কারণগুলির সাথে যুক্ত হয়েছে আরো একটি বিপদ। নিরক্ষরেখা এবং ক্রান্তীয় বলয়যুক্ত অঞ্চলগুলিতে সমুদ্রের তলাতে অবস্থিত বিভিন্ন আনুবীক্ষণিক জীব বা "পলিপ"-এর দেহরস থেকে তৈরি হওয়া প্রবাল বা "কোরাল"-এর বর্ণময় প্রাচীর থেকে বেরিয়ে আসছে সাদা জৈবরস। এই ঘটনাকে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলেছেন, "কোরাল ব্লিচিং"। এই কোরাল ব্লিচিং-এর ফলে আরো দূষিত হতে শুরু করেছে সমুদ্রের পরিবেশ।

কর্নাটকের নেচার কনজার্ভেশন ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে, কোরাল ব্লিচিং নিয়ে বিশেষ সমীক্ষা চালিয়েছিলেন পরিবেশবিজ্ঞানী রুচা কারকারে। তিনি জানিয়েছেন ১৯৯৮ সাল থেকেই বিশ্বের বহু সমুদ্র অঞ্চলে মারাত্মক হারে কোরাল ব্লিচিং শুরু হয়েছে। কেরলের পশ্চিম উপকূল থেকে দূরে অবস্থিত লাক্ষাদ্বীপে, সমুদ্রতলে ৫০০ বছরেরও বেশি পুরোনো প্রবাল-এর থেকে এই ক্ষতিকর, সাদা, জৈবরস বেরোনো বা কোরাল ব্লিচিং শুরু হয়েছে। এই প্রবাল প্রাচীরের ওপর

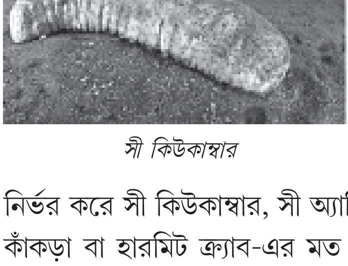

সী কিউকাম্বার

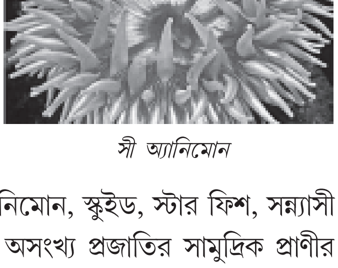

সী অ্যানিমোন

নির্ভর করে সী কিউকাম্বার, সী অ্যানিমোন, স্কুইড, স্টার ফিশ, সন্ন্যাসী কাঁকড়া বা হারমিট ক্র্যাব-এর মত অসংখ্য প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণীর জীবনযাত্রা। তবে, "কোরাল ব্লিচিং"-এর ফলে ক্রমশঃই ভাঙতে শুরু করেছে বিশ্বের বিভিন্ন সমুদ্রতলের প্রবাল প্রাচীর। বিশ্বের বৃহত্তম প্রবাল প্রাচীর অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ব্যারিয়ার রীফও "কোরাল ব্লিচিং"-এর দুর্বিপাক থেকে মুক্ত নয়। প্রবাল প্রাচীরের মধ্যে বাস করা বিভিন্ন অনুজীব-ফাইটোপ্ল্যাংকটন ও জুপ্ল্যাংকটনদেরকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে জীবনধারণ করে বহু প্রজাতির মাছ। কোরাল ব্লিচিং-এর জন্য, প্রবাল প্রাচীরের মধ্যে বসবাসকারী সেইসব প্ল্যাংকটনের মৃত্যু ঘটেছে। এর ফলে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের অস্তিত্বও আজ বিপন্ন হওয়ার মুখে। বেশিরভাগ মাছই কম বছর বেঁচে থাকে। কোরাল ব্লিচিং-এর ফলে

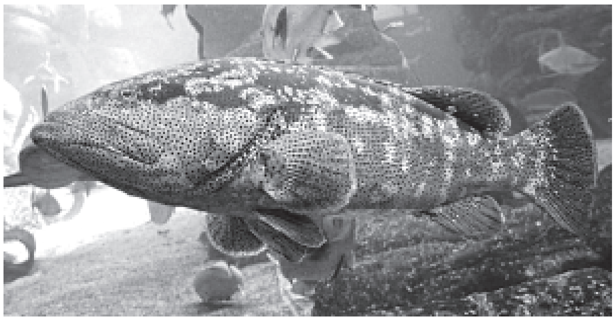

গ্রুপার

তাদের জৈবিক বা বিপাকীয় কাজকর্মেরও প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। বিশেষতঃ "এপিনেফেলিড" গোত্রের শিকারি মাছ বা "গ্রুপার" জাতীয় মাছেরা, ছদ্মবেশের জন্য এবং লুকিয়ে থেকে শিকার ধরার জন্য এই ধরনের প্রবাল প্রাচীরের বর্ণময়তার আড়ালেই বেশি লুকিয়ে থাকতে পছন্দ করে (ক্যামোফ্লেজ)। এই শিকারি মাছগুলি দৈর্ঘ্যে এক মিটারেরও বেশি হয়। মাছটির ওজন হয় ৫০ কেজিরও বেশি। প্রবাল প্রাচীর ভাঙতে থাকলে এবং কোরাল ব্লিচিং হতে থাকলে এই ধরনের মাছ অবলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাবে।

১৯৯১ সালে ভারত মহাসাগরের তলদেশে অবস্থিত প্রবাল প্রাচীরের মধ্যে এই কোরাল ব্লিচিং, সর্বপ্রথম দেখা দিয়েছিল। ধীরে ধীরে এই প্রবাল অবক্ষয়-এর শ্বেত আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে উত্তর আন্দামান থেকে মালদ্বীপ পর্যন্ত। সমুদ্রজলের উষ্ণতা বৃদ্ধিই এই কোরাল ব্লিচিং-এর অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন সমুদ্রবিজ্ঞানীরা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউকাস্‌ল্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিজ্ঞানী বারবারা ব্রাউন জানিয়েছেন—বিশ্ব উষ্ণায়ণের ফলে গত ৫০ বছরে সমুদ্রজলের গড় তাপমাত্রা প্রতি ১০ বছর অন্তর ০.১২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস করে বেড়েছে। বর্তমানে হাওয়াই, কিরিবাতি, ফরাসি পলিনেশিয়া, ফ্লোরিডা, কিউবা, বেলিজ, কেম্যান দ্বীপ, হাইতি, পানামা, বাহামা, কাইবোস দ্বীপ, দোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, মাদাগাস্কার, তানজানিয়া, মরিশাস, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, নিউ ক্যালিডোনিয়া, মার্শাল ও সোলোমন দ্বীপপুঞ্জগুলির সামুদ্রিক এলাকাতেও প্রচন্ড হারে কোরাল ব্লিচিং-এর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। এই দুর্ঘটনাটির জন্য এবং প্রবাল প্রাচীরকে নির্ভর করে গড়ে ওঠা সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র (ইকোসিস্টেম)-কে বিপর্যস্ত করার জন্য মানুষসৃষ্ট শিল্প ও রাসায়নিক দূষণকেও দায়ী করছেন অনেক বিজ্ঞানীই। সুনামি এবং সমুদ্রতলের অগ্ন্যুৎপাত ও কোরাল ব্লিচিং-এর জন্য অনেকটাই দায়ী।

M. : 9547659679

গ্রে টা থু ন বা র্গ

কি দুঃসাহস!

১৬ বছরের গ্রেটা থুনবার্গ সুইডেনের কন্যা। সক্রিয় পরিবেশ কর্মী। ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯-এ নিউইয়র্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের জলবায়ু সম্মেলনে পরিবেশের বিপন্নতা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরা হল।

এইসব কিছুই ভুল। আসলে আমার এখানে দাঁড়ানোর কথাই নয়। সমুদ্রের ওপারে আমার বিদ্যালয়েই ফিরে যাওয়া উচিত ছিল। তথাপি আপনারা আশা নিয়ে আমাদের এখানে এসেছেন। কি দুঃসাহস। আপনারা শূন্যগর্ভ শব্দ দিয়ে আমার স্বপ্ন, আমার শৈশব চুরি করেছেন। তবু আমাকেই দরকার আপনাদের। মানুষ অসুবিধায় আছেন। মানুষ মৃতপ্রায়। সমস্ত বাস্তুতন্ত্র ধ্বংসের মুখে। এক বিশাল গণবিলুপ্তির শুরুর মুখে আমরা। আর আপনারা শুধু অর্থ এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির গল্পগাছা নিয়েই কথা বলতে পারেন। কি দুঃসাহস।

৩০ বছরেরও বেশি সময়ে বিজ্ঞান যে বিপদের কথা বলে আসছে তা এখন স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। কতটা দুঃসাহস যে দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছেন এবং এখানে এসে বলেছেন আপনারা যথেষ্ট করেছেন। যখন প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক উদ্যোগ এবং সমস্যার সমাধান কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

আপনারা বলছেন যে, আপনারা নাকি আমাদের বক্তব্য শুনছেন এবং জরুরী অবস্থাটা বুঝতে পারছেন। কিন্তু এটা বিষয় নয় যে আমি কতটা দুঃখিত বা রেগে আছি, আসলে আমি বিশ্বাসই করি না আপনাদের কথা। কেননা যদি আপনারা অবস্থাটা সম্পূর্ণ বুঝতে পারেন অথচ তা সত্ত্বেও কাজটি না করতে পারেন তাহলে আপনারা অসৎ। যদিও আমি তা বিশ্বাস করতে চাইব না।

১০ বছরে কার্বন ধোঁয়া উদ্‌গিরণ অর্দ্ধেক করা হবে, এই জনপ্রিয় ধারণা আমাদের দিয়েছে শুধুমাত্র ৫০ শতাংশ সুযোগ ১.৫°C-এর নীচে তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে রোখা। এবং এটি পাল্টা দাবি করে যে মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে একটি অপরিবর্তনীয় রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে।

হতে পারে, এই ৫০ শতাংশ আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এই সংখ্যাগুলি ইঙ্গিতবাহী বিপদকে অন্তর্ভুক্ত করে না। অন্তর্ভুক্ত করে না বেশিরভাগ আগের পরিস্থিতি ফিরিয়ে দেওয়ার পদ্ধতিকে। করে না অতিরিক্ত উষ্ণতাকে, যা লুকিয়ে থাকে বিষাক্ত বায়ু দূষণের মাধ্যমে। অন্তর্ভুক্ত করে না ন্যায়বিচার এবং সমদর্শিতাকে। আমার ও আমার মতো শিশুরা যারা বাতাস থেকে শত কোটি টন CO_2 শুষে নিচ্ছি তাদের বাঁচার জন্য কিছু প্রযুক্তির উপর তারা নির্ভর করছে যা আদৌ আছে কিনা সন্দেহ। সুতরাং আমরা যারা এই দুরবস্থার মধ্যে আছি, এই ৫০ শতাংশ ঝুঁকি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

এই যে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫° সেন্টিগ্রেডের নীচে থাকার সম্ভাবনা ৬৭ শতাংশ, সবচেয়ে ভালো এই তত্ত্বটি দিয়েছেন জলবায়ু পরিবর্তনের আন্তঃসরকারের কমিটি (IPCC)। তাদের তথ্য অনুযায়ী ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারি বায়ুমণ্ডলে ৪২০ গিগাটন কার্বনডাই-অক্সাইড ছিল যা পরিশোধনের দরকার। এখন তা কমে ৩৫০ গিগাটনে দাঁড়িয়েছে।

কী করে ভাবলেন যে এটা এত সহজ কাজ? এত সাহস হয় কী করে আপনাদের। যে হারে এখনও কার্বন নিঃসরণ চলছে তাতে এই হিসেব আগামী আট, সাড়ে আট বছরের মধ্যেই ঘেঁটে যাবে। এই পরিসংখ্যান সামনে থাকলে কোনো পরিকল্পনাই তৈরি করা সম্ভব নয়। আপনারা কি এতটাও পরিণত হননি যে সত্যিটাকে সত্যি বলে স্বীকার করে নেবেন।

আপনারা আমাদের হতাশ করেছেন। কিন্তু আমাদের যুব প্রজন্ম আপনাদের বিশ্বাসঘাতকতা বুঝতে পারছে। প্রতিনিয়ত ভবিষ্যতের সকল প্রজন্মের নজর আপনাদের দিকে। এভাবে আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করলে আমরা আপনাদের ক্ষমা করব না। এ সব করে পার পেয়ে যাবেন, এমন ভাবার কারণ নেই। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে। আপনাদের ভালো লাগুক বা না লাগুক পৃথিবী জাগছে, পরিবর্তন আসছে।

ধন্যবাদ

গ্লোবাল ওয়ার্মিং : পরিবেশ বিপর্যয়

২০১৩ সালে বিশ্ব ব্যাঙ্কের গবেষণা রিপোর্ট অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু বিষাক্ত গ্যাস নিষ্কাশনের পরিমাণ ছিল ১৬.৪ মেট্রিক টন। ভারতের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ১.৬ মেট্রিক টন। উন্নত দেশগুলি প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী কার্বন নিগর্মণের হার কমানোর জন্য বিশেষ কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যদি বিশ্ব উষ্ণায়ণের হার না রোখা যায় ২১০০ সালের মধ্যে গোটা পৃথিবীতেই সমুদ্রের জলস্তরের উচ্চতা ১.১ মিটার বেড়ে যাবে। সমুদ্র উপকূলবর্তী বহু শহর তলিয়ে যাবে। এইসব এলাকার বসবাসকারী প্রায় ৬৮ কোটি মানুষ বিপদে পড়বেন। প্রতি বছরই বন্যা হবে এবং সুনামির মতো ঘটনা প্রায়ই ঘটবে। ইতিমধ্যে গ্রিনল্যান্ডের বরফের স্তর ভাঙতে শুরু করেছে। যদি বেশি মাত্রায় গলে যায়, তবে জলস্তর ২০ ফুটের বেশি বেড়ে যাবে। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতেও বরফ গলছে। কার্বনসহ দূষিত গ্যাসের নিষ্কাশনের হার যদি কমানো না যায় তবে আগামী দুশো-তিনশো বছরে সামুদ্রিক জলস্তর বেশ কয়েক মিটার বেড়ে যাবে। ফলে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ দেশ জলের নীচে চলে যাবে।

আলোচনা সভা ঃ জলের ব্যবহার, নদী ও জলাশয় সংরক্ষরণ এবং জলদূষণ

কল্যাণী মহাবিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা প্রকল্প ও বিজ্ঞান দরবার-এর উদ্যোগে ২১ সেপ্টেম্বর কল্যাণী মহাবিদ্যালয়ের সেমিনার হলে 'জলের ব্যবহার, নদী ও জলাশয় সংরক্ষণ এবং জলদূষণ' শীর্ষক সারাদিন ব্যাপী এক আলোচনা সভা ও প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী ভাষণে অধ্যক্ষ ড. রুণু দাস সেমিনারের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। জলাশয় সংরক্ষণের গুরুত্ব আলোকচিত্র সহ বক্তব্য রাখেন পরিবেশ বিজ্ঞানী ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব তপন সাহা। জলদূষণ (আর্সেনিক ও ক্লোরাইড) নিয়ে আলোচনা করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজের অধিকর্তা অধ্যাপক তড়িৎ রায়চৌধুরি। বক্তা আলোকচিত্র সহযোগে জলদূষণের নানা সমীক্ষা ও তথ্যসহ আলোচনা করেন। জলের ব্যবহার ও জল সংরক্ষণ নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন বিশিষ্ট লেখিকা জয়া মিত্র। জলদূষণ নিয়ন্ত্রণে আইনের চালচিত্র নিয়ে বক্তব্য রাখেন পরিবেশ কর্মী ও রাজ্য পরিবেশ দপ্তরের প্রাক্তন মুখ্য আইন আধিকারিক বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়। বক্তা বেশ সহজভাবে জল দূষণ নিয়ন্ত্রণে আইনগুলির ব্যাখ্যা করেন। পরিবেশ দূষণ শীর্ষক আবৃত্তি আলেখ্য পরিবেশন করে চুঁচুড়ার কাব্যনীড় সংস্থা।

জলের ব্যবহার ও জল সংরক্ষণ নিয়ে অধ্যাপিকা সংঘমিত্রা আঢ্য, বিজয়গড় জ্যোতিষচন্দ্র কলেজের নীলাঞ্জন সাহা ও সঞ্জনা দাস, কল্যাণী মহাবিদ্যালয়ের নেহা দাস, সৌমিত্র সরকার, সুদীপ মিশ্র, প্রদ্যুম্ন পাহাড়ী, অর্পিতা রায় সহ ১৬ জন ছাত্র-ছাত্রী আলোকচিত্র ও পোস্টারসহ আলোচনা করেন।

সেমিনারে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে পরিবেশ কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পরিবেশ আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। নদী বাঁচাও আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করেন অনুপ হালদার। বিজ্ঞান দরবারের পক্ষে বক্তব্য রাখেন সুজয় বিশ্বাস। সেমিনারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিজ্ঞান দরবারের সভাপতি ড. গোপালকৃষ্ণ গাঙ্গুলি ও কল্যাণী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা বাবলি সরকার। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জয়দেব দে।

প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের ১২৫ তম জন্ম-বার্ষিকী ও ২৫ তম বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার কর্মসূচি

বিজ্ঞান দরবার ও পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট এর উদ্যোগে এবং গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতি, এর সহযোগিতায় ১ অক্টোবর, কাঁচড়াপাড়া উদ্বোধনী গালর্স হাইস্কুলে প্রবন্ধ, অঙ্কন, পোস্টার প্রদর্শন, বিজ্ঞান কুইজ, বিতর্ক ও তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। এই কর্মসূচিতে কাঁচড়াপাড়া, কল্যাণী, মদনপুর, হালিশহর, গয়েশপুর, পলাশি, শালিদহ অঞ্চলের ১৫টি স্কুলের ১০০-র বেশি ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় (জল ও জলাভূমি সংরক্ষণ) হালিশহর রামপ্রসাদ স্কুলের রিতুশ্রী চক্রবর্তী, অঙ্কন প্রতিযোগিতায় (প্লাস্টিক দূষণ) বেদিভবন রবিতীর্থ বিদ্যালয়ের শুভজিৎ সরকার, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় বেদিভবন রবিতীর্থ বিদ্যালয়ের সুন্দর চট্টোপাধ্যায় ও সঞ্চিতা দত্ত, পোস্টার প্রতিযোগিতায় সেবন্তী দাস, বিতর্ক প্রতিযোগিতায় মদনপুর কেন্দ্রীয় আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ের সুরশ্রী ভট্টাচার্য, উদ্বোধনী গার্লস হাই স্কুলের প্রিয়া কুণ্ডু ও কুইজ প্রতিযোগিতায় কাঁচড়াপাড়া মিউনিসিপ্যাল পলিটেকনিক হাই স্কুলের দিপাংশু সাহা, সৌম্যদীপ সরকার ও অলীক দাসগুপ্তকে পুরস্কার দেওয়া হয়। অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্র-ছাত্রীদের শংসাপত্র দেওয়া হয়। প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্রের জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কোষাধ্যক্ষ ও অধ্যাপিকা ড. সুমিত্রা চৌধুরী।

ত ন্ম য় ধ র

আজব যত নীহারিকা

ধুলো আর গ্যাস দিয়ে তৈরি সুবিশাল নীহারিকাগুলিই নক্ষত্রসৃষ্টির আঁতুড়ঘর। আবার নক্ষত্রের জীবনের অন্তে সুপারনোভা বা হাইপারনোভা বিস্ফোরণেও সৃষ্টি হয় বিশাল নীহারিকা। আমাদের দৃশ্যমান আকাশেই রয়েছে বেশ কিছু রহস্যময় নীহারিকা যাদের প্রকৃত রূপ, আচরণ এবং গতিপ্রকৃতি বিজ্ঞানীদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। ছায়াপথের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা এইসব নীহারিকার কাহিনী শোনা যাক—

বুমেরাং নীহারিকা (Boomerang nebula)

পৃথিবী থেকে প্রায় ৫০০০ আলোকবর্ষ দূরে অশ্বমানব নক্ষত্রমণ্ডলে (constellation Centaurus) রয়েছে এই বিস্ময়কর নীহারিকাটি। বুমেরাং নীহারিকা গ্রহসদৃশ নীহারিকার পূর্বাবস্থা (Protoplanetary nebula)। কেন্দ্রীয় তারকাটি এখনো অতিবেগুনি রশ্মি বিকীরণের মত তাপমাত্রায় পৌঁছায়নি। তাই ধুলোয় প্রতিফলিত অন্যান্য তারকার আলোয় এই নীহারিকা এখন দৃশ্যমান।

কিন্তু বর্ণবৈচিত্র্য আর আকৃতির জন্য নয়, বুমেরাং নীহারিকার বিস্ময় লুকিয়ে আছে অন্য এক ক্ষেত্রে। এই নীহারিকার তাপমাত্রা মাত্র ১ কেলভিন (-২৭২.১৬ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) চরম শূন্যের মাত্র ১ ডিগ্রি ওপরে। আর এই জন্যই, বুমেরাং নীহারিকাই হল ব্রহ্মাণ্ডের শীতলতম স্থান। কি করে সম্ভব হল অমন চরম শীতলতা? তার কারণ এখনো পুরোপুরি জানা যায়নি। তবে বহির্মুখী গ্যাসের তীব্র প্রসারণ-বেগের জন্যই ওই নীহারিকা অত ঠান্ডা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রায় ১৬৪ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড বেগে নীহারিকাটি বহির্মুখে প্রসারিত হচ্ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ব্রহ্মাণ্ডের আবহস্তরের তাপমাত্রা মাত্র ২.৭৪ কেলভিন। অর্থাৎ নক্ষত্রের নিউক্লিওসিন্থেসিস প্রক্রিয়া এবং অ্যাস্টরয়েডের সংঘর্ষ প্রক্রিয়া বাদ দিলে বিগ ব্যাং মহাবিস্ফোরণের পর থেকে ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ এবং শীতলীভবনের ফলে ব্রহ্মাণ্ডের যে নিজস্ব তাপমাত্রা তা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ২.৭৪ কেলভিনে। তার থেকেও নিম্ন তাপমাত্রায় থাকার ফলে বুমেরাং তাপীয় অস্থিরতা কি করে সামলায়, সেটা বিজ্ঞানীদের কাছে আশ্চর্যের।

ঈগল নীহারিকা (Eagle nebula)

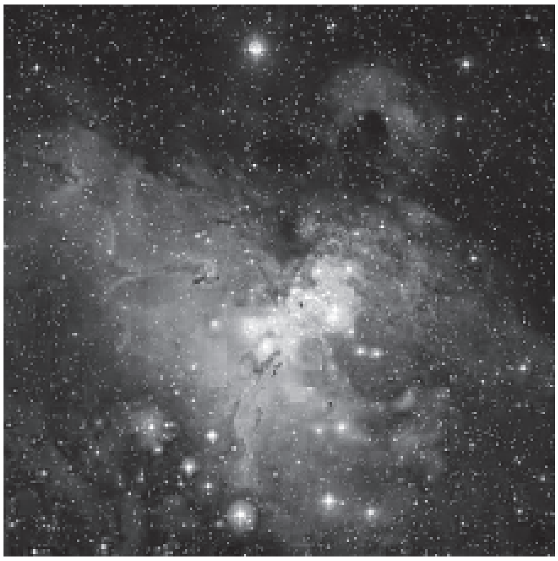

নতুন তারা তৈরির স্বর্গরাজ্য এই অদ্ভুত সুন্দর নীহারিকাটি। পৃথিবী থেকে প্রায় ৭০০০ আলোকবর্ষ দূরে সর্পমণ্ডলীর (constellation Serpens) গভীরে রয়েছে ঈগল নীহারিকা। ওর স্তম্ভের আকৃতির সুবিশাল গ্যাসপুঞ্জগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড়টি প্রায় ৯০ আলোকবর্ষ লম্বা মানে ওর ভেতর সূর্য-গ্রহমণ্ডলী-ধুমকেতু সমেত সৌরজগতকে রাখলে ২৬ খানা সৌরজগৎ স্বচ্ছন্দে ওর ভেতর এঁটে যাবে। ঈগল নীহারিকাকে বিজ্ঞানীরা আদর করে 'সৃষ্টিস্তম্ভ' (Pillars of creation) বলেও ডাকেন। নীহারিকাটি নক্ষত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে অতি সক্রিয়। এযাবৎ ৪৬০টি উজ্জ্বল তারা তৈরি হয়েছে ওই নীহারিকায়। তারাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড়টি সূর্যের চেয়ে ৮০ গুণ ভারী। নীহারিকার কেন্দ্রীয় অংশে থাকা মাত্র ১৫ লক্ষ বছর বয়স্ক ওই তারাটি উজ্জ্বলতা সৌর-উজ্জ্বলতার ১০ লক্ষ গুণ।

১৯৯৫ সাল থেকে হাবল স্পেস টেলিস্কোপ ঈগল নীহারিকায় চিরুনি তল্লাশি শুরু করে। তার পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ওই অতিকায় স্তম্ভগুলি হাইড্রোজেন গ্যাস আর ধুলোয় তৈরি। স্তম্ভগুলি মূলত শিশু-নক্ষত্রদের বিছানা হিসেবে কাজ করে। সম্প্রতি স্পিটজার অবহেলিত টেলিস্কোপের পর্যবেক্ষণে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। ঈগল নীহারিকার ওই সুন্দর স্তম্ভাকৃতি নাকি নিকটবর্তী একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণে নষ্ট হয়ে গেছে। ২০০৭ সালে স্পিটজারের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে যে, সমগ্র নীহারিকাটিই ৮০০০ বছর আগে ঘটা সুপারনোভার ধাক্কায় বিঘ্নিত। ৭০০০ আলোকবর্ষ দূরের ওই সুপারনোভার আলো প্রায় ১০০০ বছর আগে পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু সুপারনোভা-পরবর্তী শক অয়েভ বা অভিঘাত তরঙ্গ আলোর চেয়ে অনেক ধীর গতিতে চলে নীহারিকার স্তম্ভগুলি ভেঙে ফেলেছে। পৃথিবীতে সে অভিঘাত তরঙ্গ আজ থেকে আরো হাজারখানেক বছর পরে পৌঁছবে। তখন ওই ভাঙনের দৃশ্য দেখা যাবে।

email : tstorm.tanmay@gmail.com ● M. 9892359674

পলক বন্দ্যোপাধ্যায় M. 9903424119

শব্দের খোঁজে : (দেশ-বিদেশ)

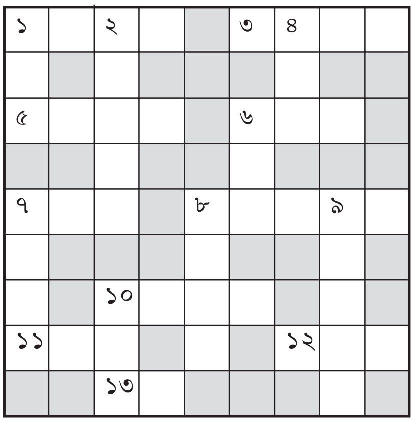

পাশাপাশি :

১. ক্যারেবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের একটি উল্লেখযোগ্য দ্বীপ। প্রথম তিনে জামাতা।
৩. মধ্যপ্রাচ্যে পারস্য উপসাগরীয় এলাকার এই দ্বীপরাষ্ট্রে রাজতন্ত্র বর্তমান। একে-দুইয়ে বাহবা, একে-চারে নদীর অকস্মাৎ জলস্ফীতি।
৫. এই দেশের রাজধানী অস্লো। তিনে-চারে ইঙ্গে উপায়।
৬. উত্তর আমেরিকার এই দেশ আয়তনে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম, একে-দুইয়ে চক্ষুহীন।
৭. পূর্ব এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত এই উপদ্বীপ উত্তর ও দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত স্বতন্ত্র রাষ্ট্রদ্বয়।
৮. মোদের জন্মভূমি।
১০. এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত তুরস্কের রাজধানী।
১১. 'দোহা' এই দেশের রাজধানী, একে-তিনে ইঙ্গে গাড়ি, দুইয়ে-তিনে ধাতুর তৈরি সূত্র।
১২. এই দেশটির ঐতিহাসিক নাম পারস্য। দুইয়ে-তিনে ইঙ্গে দৌড়।
১৩. পশ্চিম জার্মানির এই শহর রাইন নদীর তীরে অবস্থিত, পাখা এমন করে ঘোরে।

উপর নীচ :

১. এই দেশ 'সূর্যোদয়ের দেশ' হিসাবে পরিচিত।
২. আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত এই দেশের রাজধানী আদিস্ আবাবা।
৪. কিউবার রাজধানী, একে-তিনে পুলিশ প্রায়শই অপরাধীর খোঁজে এটা দিয়ে থাকে।
৬. পাকিস্তানের এই শহরটি লাহোরের দক্ষিণে অবস্থিত। একে-তিনে পাকানো সরু সুতো, দুইয়ে-তিনে সঙ্গীতের নিয়ন্ত্রিত ধ্বনি।
৭. মধ্য আমেরিকায় অবস্থিত এই রাষ্ট্র। একে-চারে জনপ্রিয় ঠান্ডা পানীয় —— কোলা। তিনে-চারে উল্টে ইঙ্গে 'ঝোল'।
৮. পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র, পোপের নিবাস।
৯. এই প্রণালী ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের সীমা নির্ধারক, একে-দুইয়ে "কান ধরে ওঠ—", তিন-চার ও পাঁচে সম্রাট আলেকজান্ডারের গতিরোধ করে দাঁড়ানো এক নির্ভীক ভারতীয় রাজা।
১০. মধ্যপ্রাচ্যের তেল উৎপাদনকারী এক ধনী দেশ। দুইয়ে-তিনে "আওয়াজ"।

জগন্ময় মজুমদার

চন্দ্রগ্রহণে পিকনিক

চাঁদ দেখতে দেখতে হবে আমাদের পিকনিক।
কোথায় চাঁদ, ছিল চন্দ্রগ্রহণ।

এ সময় খেতে নেই কিছু, পিপাসায় জল
—আমরা শুনিনি কারো কোনোই বারণ।

আমরা গেয়েছি; 'আজি জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে'
জ্যোৎস্না কোথায়, মনে মনে ছিল বন!

কোথায় কি হয়, হয় না কিছুই
রাস্তা কাটলে বিড়াল
গ্রহণে কুটলে মাছ ঠোঁটকাটা হয় গর্ভের শিশু
মিথ্যে, ভুলভাল।

সেদিন ছিল কালোজ্যোৎস্না—ছাদে পিকনিক
মোমবাতি জ্বলেছিল
আর ছিল গোটা কয় মাথাভাঙা লণ্ঠন।

কার্টুন : সৌরভ মুখার্জী M. 9830470334

স্বত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পো ঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো ঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস ঃ রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ ● সম্পাদক ঃ তাপস মজুমদার। ফোন ঃ ৯৮৭৪৭৭৮২১৬/৯৪৭৪৩৩০০৯২
সম্পাদকমণ্ডলী ঃ বিজয় সরকার, প্রবীর বসু, শিবপ্রসাদ সর্দার, সম্রাট সরকার, অনুপ হালদার, সুজয় বিশ্বাস
e-mail : bijnandarbar1980@gmail.com / ganabijnan@yahoo.co.in, Whatsapp No. 8240665747, website : www.ssu2011.com/bigyan-anneswak